জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১১, সংখ্যা-১, জানুয়ারি-জুন ২০২১

মানবেতর প্রাণীর নৈতিক মূল্য : একটি দার্শনিক পর্যালোচনা

মিতালী ঘোষ*

Abstract

In recent years, there have been a remarkable number of views and opinions which have reignited the discussions on environmental ethics in regarding the issue of animal rights but notable among them are- the moral value of human beings and animals, and the moral relationship between them. In terms of this relationship, the discourse of environmental ethics is divided into two streams- anthropocentric and non-anthropocentric. The first one discusses about human superiority and the use of several elements of environment in human needs, whereas the other one deals with the matter of moral consideration of non-human beings. However, there's a debate as to whether the animals exist in the environment have moral value or morality cannot be imposed on them. So, this article will address the point of moral value of non-human beings from the perspective of philosophy.

ভূমিকা

সাম্প্রতিককালে আলোচিত বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে পরিবেশ নীতিবিদ্যার আলোচনা অপেক্ষাকৃত জটিল। কারণ, আলোচিত এইসব বিষয়সমূহ বিভিন্ন সময় আমাদের অনেক নৈতিক প্রশ্নের সম্মুখীন করে তোলে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে, মানবেতর প্রাণীর প্রতি মানুষের নৈতিক বিবেচনার বিষয়টি। বহুকাল আগে থেকেই উক্ত বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন দার্শনিক মহলে আলোচনা হয়ে আসছে। তবে প্রথম সাড়া জাগানো আলোচনা হয় বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকে যা পরবর্তীকালে আন্দোলনে রূপলাভ করে। নৈতিক আচরণের এই আলোচনায় যেসব দার্শনিক মানবেতর প্রাণীর নৈতিক মূল্য আছে বলে মনে করেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য হলেন- জেরেমি বেন্থাম, টম রিগান, পিটার সিঙ্গার, স্টিফেন ক্লার্ক, মেরি মিজলি, হোমস রলস্টন, মার্টিন বেঞ্জামিন, জেমস স্টারবা প্রমুখ। তবে যেসব দার্শনিক মানবেতর প্রাণীর নৈতিক মূল্যের বিষয়টি মানতে নারাজ তাঁদের মধ্যে দেকার্ত, হিউম, কান্ট, ডোনাল্ড ডেভিডসন, কার্ল কোহেন প্রমুখ অন্যতম।

মানবেতর প্রাণীর নৈতিক মূল্য আদৌ আছে কি না অর্থাৎ নৈতিক মর্যাদা ও অধিকারের প্রশ্নটিকে আমরা যদি মূল্যের আলোকে বিচার করি তবে মূল্যের দুটি রূপ পাই- স্বতঃমূল্য (Inherent value) ও পরতঃমূল্য। স্বতঃমূল্য হলো তাই যা নিজে নিজেই মূল্যবান অর্থাৎ মূল্যের জন্য অন্য কোন সত্তার উপর নির্ভর করতে হয় না। আর, পরতঃমূল্য হলো অন্য সত্তার সহায়ক হিসেবে মূল্যবান এবং এ মূল্যের অধিকারীদের নিজেদের বিচার-বিবেচনা করার ক্ষমতা নেই। সকল মানবকেন্দ্রিকতাবাদী দার্শনিক অর্থাৎ যারা মানুষের স্থানকে উর্ধ্বে রেখেছেন, তাঁরা শুধু মানুষের ক্ষেত্রেই স্বতঃমূল্যের ধারণাকে স্বীকার করেন। কারণ মানুষের রয়েছে স্ব-শাসন বা বিচার-বিবেচনার ক্ষমতা অর্থাৎ আত্মসচেতনতা। স্বতঃমূল্য থাকার জন্য মানুষ নৈতিক সমাজের সদস্য বলে বিবেচিত হয়। তবে এর বিপরীতে তাঁরা মানবেতর প্রাণীর পরতঃমূল্যের কথা বলেন। কারণ, ভালো-মন্দের পার্থক্য করার ক্ষমতা মানবেতর প্রাণীর নেই অর্থাৎ এরা আত্মসচেতন নয় বা স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণেও

* সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়, বরিশাল

সক্ষম নয়। তাই, নৈতিক সম্প্রদায়ের সদস্য হওয়ার কোন যোগ্যতা এদের নেই বলেই তাঁরা মনে করে থাকেন। তবে, জেরেমি বেন্থাম এবং পিটার সিঙ্গারের মতো অনেক নীতি দার্শনিকই সমতার নীতি অর্থাৎ সকল প্রাণী সমান এই নীতিতে বিশ্বাসী। তাঁরা মানুষের মতো মানবেতর প্রাণীকেও স্বতঃমূল্যে মূল্যবান মনে করে নৈতিক বিবেচনার দাবিদার হিসেবে আখ্যা দিয়ে থাকেন।

এখন প্রশ্ন হলো, মানবেতর প্রাণী বলতে আসলে আমরা কোন প্রজাতিকে বুঝি আর তাদের অধিকার বলতেই বা কী বোঝানো হয়? আমরা জানি, মানুষ ছাড়াও এই পৃথিবীতে অসংখ্য প্রাণের অস্তিত্ব বিদ্যমান। এইসব প্রাণীর চেতনা থাকলেও বোধশক্তি বা ভালো-মন্দ বোঝার ক্ষমতা বেশির ভাগেরই নেই। এদের আমরা মানবেতর প্রাণী বলে থাকি। মানুষ তাদের নিজেদের প্রয়োজনে এ সমস্ত প্রাণীদের ব্যবহার করে বা তাদের সাথে বিভিন্ন ধরনের অনৈতিক আচরণ করে থাকে যা আসলেই কাম্য নয়। কারণ প্রাণীদেরও অধিকার আছে, মূল্য আছে যেভাবে অন্য সত্তার অধিকার এবং মূল্য রয়েছে। এই অধিকার হলো এক প্রকার দাবি, যে দাবিতে তারা ক্ষতিগ্রস্থহীনভাবে বাঁচার প্রত্যাশা করতে পারে। এই অধিকারের বলে প্রাণীরাও নৈতিক মূল্যে মূল্যবান বলে প্রাণী অধিকারের প্রবক্তাগণ মনে করে থাকেন।

মানবেতর প্রাণীদের প্রতি আমাদের নৈতিক আচরণ করতে হবে কারণ প্রাণীরাও নৈতিক মূল্যে মূল্যবান। আর এই মর্মে যেসব দার্শনিক মতামত ব্যক্ত করেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন অষ্টাদশ শতকের উপযোগবাদী দার্শনিক জেরেমি বেন্থাম। বেন্থাম তাঁর *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (1789) গ্রন্থের সপ্তদশ অধ্যায়ে মানবেতর প্রাণীর আলোচনায়, তারা যে অবহেলিত হচ্ছে সে বিষয়ের উপর আলোকপাত করেন। তিনি উল্লেখ করেন, " অন্যান্য প্রাণীরা, তাদের যেসব সুবিধা পাওয়ার কথা তা থেকে তারা উপেক্ষিত হচ্ছে সেকেলে আইনজ্ঞদের বোধহীনতার জন্য, অবস্থানের অধঃপতন ঘটছে শ্রেণিকরণের জন্য।"[১] আইনি প্রক্রিয়ায়ও আবেগবোধ, মানুষ ও কম বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন প্রাণীর জন্য একই অর্থ বহন করে না বলে তিনি উল্লেখ করেন। তবে তিনি মানবেতর প্রাণীকে মানুষের মতো নৈতিক মূল্যে মূল্যবান মনে করে স্বার্থের সমবিবেচনার নীতি অর্থাৎ সকলের স্বার্থ সমান বা নৈতিক দিক থেকে মানুষ এবং প্রাণী সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ মর্মে মত প্রকাশ করেন। তিনি নীতিটিকে একটি মৌলিক নীতি হিসেবে বিবেচনা করেন। তাঁর মতে, সত্তা যে প্রকৃতিরই হোক না কেন যন্ত্রণার সংবেদন সব সত্তার জন্য একই হবে। কারণ যন্ত্রণার সংবেদন আচরণের মধ্যে দিয়েই প্রকাশ পায়, সেটা হোক মানব বা অ-মানব সত্তা। আর সত্তার যদি কষ্টভোগের সংবেদন থাকে তাহলে অন্য সত্তার মতো এই কষ্টভোগকে বিবেচনা করে হলেও উক্ত সত্তার নৈতিক ন্যায্যতা দিতে হবে। তিনি ভবিষ্যতবাণীও করেন যে, "এমন একদিন আসতে পারে, যেদিন মানবেতর প্রাণীর অবশিষ্ট বংশধরগণ সেই অধিকার অর্জন করতে পারে আর যা শুধু স্বৈরশাসক ছাড়া তাদের থেকে কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।"[২]

প্রাণীদের যে সংবেদনশক্তি আছে তা কিন্তু কোনভাবেই আমরা অস্বীকার করতে পারি না। মানুষের মতো প্রকাশভঙ্গি না থাকলেও আঘাত পেলে কষ্টের অনুভূতি তারাও অনুভব করে। কুকুরের প্রভূভক্তি সম্পর্কে আমরা কমবেশি সবাই জানি আর সেটা সংবেদনের অনুভূতি না থাকলে সম্ভব নয়। বাঘ, বিড়াল এমনকি হাতিরও রয়েছে প্রচণ্ড ঘ্রাণশক্তির অনুভূতি অর্থাৎ প্রাণীদের যে অনুভূতি

আছে তা আমরা উপেক্ষা করতে পারি না। তাই প্রাণীদের কষ্টকে বিবেচনায় এনে নৈতিক ন্যায্যতা দিতে হবে যেমনটা মানুষের কষ্টকে বিবেচনায় আনা হয়।

ব্রিটিশ দার্শনিক মেরি মিজলিও তাঁর *Beast and Man* (1978) এবং *Animals and Why They Matter* (1983) গ্রন্থদ্বয়ে মানবেতর প্রাণীর স্বার্থসংরক্ষণ এবং নৈতিক মর্যাদা প্রদানের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। তিনি মানুষ এবং মানবেতর প্রাণীর অভিন্ন এমনকি তাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ কাছাকাছি মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি মনে করেন, মানুষ এবং মানবেতর প্রাণীর সম্পর্ক ভালোভাবে অনুধাবন করা যাবে প্রাণীআচরণ বিজ্ঞানের গুণগত পদ্ধতিসমূহ (qualitative methods of ethology) এবং তুলনামূলক মনোবিজ্ঞান দ্বারা। তিনি এটা স্পষ্ট করেন যে, "এটা কখনো সত্য নয় যে, কিভাবে মানুষের সাথে আচরণ করতে হবে এটা জানার জন্য সে কোন জাতির অন্তর্ভূক্ত সেটা অবশ্যই প্রথমে খুঁজতে হবে... কিন্তু প্রাণীর ক্ষেত্রে, প্রজাতি জানা একেবারে অপরিহার্য।"[৩] তাঁর মতে, প্রাণীদের জীবন মানুষ যতটা বিশৃঙ্খল হিসেবে চিন্তা করতে অভ্যস্ত ঠিক ততটা নয়, বলা যায় কিছুটা শৃঙ্খলাবদ্ধ। এমনকি মানুষের চেয়ে যতটা ভিন্ন ভাবি তার চেয়ে কম অর্থাৎ অনেকটা কাছাকাছি বৈশিষ্ট্যের (তবে যে পার্থক্য আছে তা ভিন্ন ধরনের পার্থক্য) বলা যায়। তবে মানুষ নিজেদের তৃপ্ত করে বিশৃঙ্খলার সমুদ্রে একটা সুশৃঙ্খল দ্বীপ মনে করে। এক্ষেত্রে অস্ট্রিয়ান প্রাণীবিশারদ কনার্দ লরেঞ্জও মনে করেন, এসব পার্থক্য করা হয় তারা যেমন ঠিক তা থেকে নয় বরং অনেকটা নিজস্ব ভীতি এবং ইচ্ছার তাগিদে। যেমন একটা নেকড়ের ক্ষেত্রে আমরা সর্বদা চিন্তা করি নেকড়ে মেষপালকের সামনে হাজির হবে তখন, যখন মেষপাল থাকবে বা মেষশাবককে ধরা যাবে। মেষশাবকের সাথে আচরণ দেখে আমরা এমন ধারণা পোষণ করি। কিন্তু প্রাণীর আচরণ নিয়ে গবেষণায় দেখা গেছে, নেকড়ে তার সঙ্গী এবং সন্তানের কাছে বিশ্বস্ত এবং অনুরক্ত। এমনকি তার দলের কাছেও বিশ্বস্ত আর বিপদের সময়ে পরাক্রম দেখানোর সাথে সাথে একে অন্যের অঞ্চলকে সমীহ করে চলে, নিজেদের থাকার জায়গা পরিচ্ছন্ন রাখে।[৪] এভাবে মেরি মিজলিও মানুষ এবং মানবেতর প্রাণী অনেকটা কাছাকাছি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মর্মে মতপ্রকাশ করে প্রাণীদের স্বার্থ সংরক্ষণের উপর জোর দিয়েছেন। আমরা জানি, প্রাণীর স্বার্থ রক্ষা করা মানুষের নৈতিক দায়িত্ব কিন্তু সে দায়িত্ব কাছাকাছি বৈশিষ্ট্যের জন্য পালন করতে হবে তেমন নয়, বরং প্রাণীর অধিকার আছে নৈতিকভাবে মূল্যায়িত হওয়ার।

অন্যদিকে, পল টেইলর তাঁর *Respect for Nature* (1986) গ্রন্থে প্রাণীসহ পরিবেশের সকল উপাদানকে স্বতঃমূল্যে মূল্যবান বলে অভিহিত করেছেন। তিনি মানুষকে আত্মসচেতন, প্রাণীকে সচেতন এবং পরিবেশের অন্যান্য উপাদানের মধ্যে চেতনা আছে বলে মনে করেন।[৫] নিজেদের স্বার্থে আমরা যেন প্রকৃতির কোনরূপ ক্ষতিসাধন না করি সেদিকে দৃষ্টিপাত করতে হবে। মানবেতর প্রাণী আর উদ্ভিদ শুধু নয় , পাহাড়-পর্বত এমনকি নদী-নালারও স্বতঃমূল্য আছে বলে টেইলর মনে করেন। প্রকৃতির সব উপাদানের যেহেতু সহজাত বা স্বতঃমূল্য রয়েছে সেহেতু এক প্রজাতির স্বার্থে অন্য প্রজাতিকে ব্যবহার করা সম্পূর্ণ অনৈতিক বলে মনে করেন তিনি। প্রকৃতির প্রতি আমাদের পরম নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে হবে আর সেই দৃষ্টিভঙ্গিই হবে প্রকৃতির প্রতি সম্মান। এভাবে বন্য প্রকৃতিকে স্বতঃমূল্যে মূল্যবান মনে করা মানুষের নৈতিক কর্তব্য বলে মনে করেন তিনি।

প্রাণী অধিকার আন্দোলনের অন্যতম প্রতিনিধিত্বকারী আমেরিকান নীতিদার্শনিক টম রিগান মানবেতর প্রাণীর প্রতি নৈতিক বিবেচনার দিকটি তুলে ধরেন। রিগান মনে করেন, মানবেতর প্রাণী

স্বতঃমূল্যে মূল্যবান এজন্য তাদের অধিকার আছে আর অধিকার থাকা মানে নৈতিক কর্তা হিসেবে সমবিবেচনা পাওয়ার যোগ্য। সহায়ক বা কারণিক মূল্য হিসেবে নয় বরং অন্তর্নিহিত মূল্য থাকার জন্যই নৈতিক অধিকারের উদ্ভব ঘটে। তাছাড়া প্রাণীদেরও মানুষের মতো জীবন আছে আর জন্ম, বিকাশ, মৃত্যুও ঘটে। তাই, তাদের স্বাভাবিকভাবে বাঁচার অধিকার আছে এমনকি তাদের জীবনের মূল্য মানুষের জীবনের মূল্যের মতো বলে তারাও মানুষের মতো নৈতিক মূল্যে মূল্যবান। তিনি তাঁর *The Case for Animal Right* (1983)[৬] গ্রন্থে মানবেতর প্রাণীর স্বার্থসংরক্ষণের জন্য কয়েকটি বিষয়ের উপর জোর দেন-

(ক) গবেষণাকার্যে প্রাণীকে ব্যবহার করে বিভিন্ন উপায়ে যে যন্ত্রণা দেওয়া হয় তা বিলোপ করতে হবে।

(খ) অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনে প্রাণী লালন-পালন সম্পূর্ণ রোধ করতে হবে।

(গ) ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যরূপে, শিকারের জন্য এবং ফাঁদে আটকানোর মতো কাজগুলো সম্পূর্ণ বর্জন করতে হবে।

তিনি মনে করেন, মানবেতর প্রাণীকে সম্পদরূপে গণ্য করে চিকিৎসা, গবেষণা বা খেলাধুলার কাজে ব্যবহার করা সম্পূর্ণ অনৈতিক কাজ। কারণ, মানুষের মতো মানবেতর প্রাণীরও জীবনের প্রতি অধিকার অর্থাৎ ক্ষতিগ্রস্থহীনভাবে বাঁচার অধিকার আছে। তিনি মানবেতর প্রাণীদেরও মানুষের মতো জীবনের সামগ্রিকতা (Subjects-of-a-life) আছে বলে মনে করেন। জীবনের সামগ্রিকতা হিসেবে বিশ্বাস, আকাঙ্ক্ষা, স্মৃতি, অনুভূতি, সচেতনতা ইত্যাদি বিষয় মানুষের মতো প্রাণীদের মধ্যেও বিদ্যমান অর্থাৎ প্রাণীদের অনুভূতি আমাদের অনুভূতিরই অনুরূপ। জীবনের সামগ্রিকতা নৈতিক অধিকারকে ধারণ করে তবে তা আইনগত অধিকার নয়। এই নৈতিক অধিকার জীবনের সামগ্রিকতার অধীনে এবং তা অবশ্যই বর্ণ, জাতি, লিঙ্গ, নির্বিশেষে। মানুষ যখন প্রাণীর অধিকারের কথা বলে তখন তারা বলেনা যে, গরুর ভোটের অধিকার, শুকরের শুনানীর অধিকার বা বিড়ালের ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার বরং একটা স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে স্বতঃমূল্য রয়েছে এবং সেই মূল্যের আলোকে আচরণ করার কথা বলে। রিগানের মতে:

> আমরা অনেকেই জানি, সমস্ত প্রাণীর জীবনের সামগ্রিকতা (Subjects-of-a-life) আছে অর্থে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং স্বতঃমূল্য আছে যদি আমরা সেভাবে মূল্যায়ণ করি। এরপর একে অন্যের প্রতি কর্তব্যের সর্বোৎকৃষ্ট তত্ত্বে উপনীত হওয়ার উদ্দেশ্যে, আমরা ব্যক্তি হিসেবে অবশ্যই আমাদের সমান স্বতঃমূল্য স্বীকার করবো। অনুভূতি বা আবেগ নয়, যুক্তিই আমাদের বাধ্য করে এইসব প্রাণীদের আমাদের সমান স্বতঃমূল্যের স্বীকৃতি দিতে এবং একই সাথে তাদের সমান অধিকার সম্মানের সাথে বিবেচনা করতে।[৭]

রিগান মনে করেন, সব সত্তারই সমানভাবে স্বতঃমূল্য রয়েছে আর এই মূল্য নৈতিক কাজের মাধ্যমে অর্জিত হয়না বা খারাপ কাজের মধ্যে দিয়েও হারায়না। যেভাবে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল এবং এডলফ হিটলার জীবনের সামগ্রিকতায় সমানভাবেই স্বতঃমূল্যের অধিকারী ছিলেন। স্বতঃমূল্যে এমন কিছু নয় যা ফ্যাশন, জনপ্রিয়তা বা বিশেষ অধিকারে বাড়ে বা কমে। তিনি যেকোনো বিশেষ শ্রেণির, তা হোক মানব বা মানবেতর প্রাণী; বিশেষ নৈতিক মর্যাদা থাকা উচিত নয় বলে মনে করেন। কারণ, উক্ত বিশেষ মর্যাদার অধিকারী শ্রেণি অন্যান্য শ্রেণির জন্য হুমকিস্বরূপ হবে। তাই সবার সমান

মর্যাদা থাকা উচিত। সুতরাং স্বতঃমূল্যের আলোকে বিচার করে সমস্ত সত্তাই নৈতিক বিবেচনায় বিবেচিত বলে মতপ্রকাশ করেন।

প্রাণী অধিকার আন্দোলনের পুরোধা অস্ট্রেলিয়ান সমকালীন নীতিদার্শনিক পিটার সিঙ্গারও বেন্থামের মতো সমতার নীতির কথা বলেন। তিনি তাঁর *Animal Rights and Human Obligations* (edited, 1975), *Animal Liberation* (1975) এবং *Practical Ethics* (1979) গ্রন্থসমূহে মানবেতর প্রাণীর নৈতিক মূল্য সম্বন্ধে আলোকপাত করেছেন। মানুষের যেমন স্বতঃমূল্য আছে তেমনি প্রাণীরও স্বতঃমূল্য আছে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। সিঙ্গার সমতার নীতিকে মানদণ্ড হিসেবে ধরে মানবেতর প্রাণীর স্বতঃমূল্য তথা নৈতিক মূল্যের পক্ষে তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেন। যেখানে তিনি ভিত্তি হিসেবে 'the principle of equal consideration of interests' বা স্বার্থের সমবিবেচনার নীতির কথা বলেন। এই নীতির মর্মার্থ এই যে, আমাদের নৈতিক বিচার-বিবেচনায় নিজেদের স্বার্থকে যেভাবে গুরুত্ব দিয়ে থাকি; ঠিক তেমনি সকলের স্বার্থের প্রতি সমভাবে গুরুত্ব অর্থাৎ নিরপেক্ষভাবে সকলের স্বার্থের প্রতি সমান গুরুত্ব প্রদান করার কথা বলে। সিঙ্গার সমতার এই নীতিটিকে কেবল মানব সমাজ বা মানব প্রজাতির ক্ষেত্রে ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন না বরং সমস্ত প্রাণীর ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য বলে মনে করেন। নীতিটিকে তিনি মানব ও মানবেতর প্রাণীর মাঝে সম্পর্ক স্থাপনের নৈতিক ভিত্তি হিসেবে দেখেছেন। স্বার্থের ক্ষেত্রে সকলের স্বার্থ সমানভাবে বিবেচনাযোগ্য অর্থাৎ সকল প্রাণী সমান তাই শুধু মানবজাতির মাঝে নীতিটিকে সীমিত রাখা অনৈতিক বলে মনে করেন তিনি। সিঙ্গারের মতে, "আমরা যখন মানুষের জন্য সমতার নীতিকে গ্রহণ করি, তখন এরই সাথে কিছু অ-মানব প্রাণীর জন্যও নীতিটিকে গ্রহণ করার ভার অর্পিত হয়।"৮ স্বার্থ স্বার্থই সেটা হোক মানুষ বা মানবেতর প্রাণী। তাই, নিজেদের স্বার্থের জন্য নিম্নতর প্রাণীর স্বার্থ যাতে ক্ষতিগ্রস্থ না হয় সেদিকে সিঙ্গার কঠোর দৃষ্টিপাত করেছেন। খামার পদ্ধতিতে মানবেতর প্রাণীর লালনপালন, ঔষধ তৈরি এবং তার প্রাথমিক প্রয়োগের জন্য গবেষণাগারে প্রাণীকে পরীক্ষণ পাত্র (subject) হিসেবে ব্যবহার বা বিলাসিতার জন্য প্রাণী ব্যবহারের বিরুদ্ধে তিনি মত প্রকাশ করেছেন। কারণ, বিভিন্ন বিপজ্জনক পরীক্ষণে প্রাণীদের ব্যবহার করা হয় আর যেখানে অর্ধেক প্রাণীই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বিভিন্ন নামীদামী প্রতিষ্ঠান নতুন নতুন প্রসাধনী সামগ্রী উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন প্রাণীর উপর পরীক্ষণ কার্য চালায়, যদিও আমাদের এ পর্যন্ত উৎপাদিত প্রসাধনী দিয়েই কাজ চালিয়ে নেওয়া সম্ভব। তাই নতুন পণ্য উৎপাদন বিলাসিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এসব কাজকে তিনি অনৈতিক বলে মনে করেন কারণ, স্বাধীন চিন্তাশক্তি না থাকলেও মানবসত্তার যেমন যন্ত্রণার অনুভূতি আছে ঠিক তেমনি যন্ত্রণা এবং ব্যথার অনুভূতি মানবেতর প্রাণীরও অনুভূত হয় অর্থাৎ তাদের সুখ-দুঃখ ও ব্যথার অনুভূতি আছে। মানুষ কষ্ট পেলে যে ধরণের আচরণ করে; ভাষার মাধ্যমে সেটা প্রকাশ করতে না পারলেও প্রাণী সেই একইরূপ কষ্ট আচরণের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করে বলে সিঙ্গার মনে করেন। সিঙ্গারের মতে:

> যদি একটি সত্তা যন্ত্রণা ভোগ করে তবে সেই যন্ত্রণাকে বিবেচনায় না এনে প্রত্যাখ্যান করার কোন নৈতিক ন্যায্যতা নেই। সত্তার প্রকৃতি কি সেটা ব্যাপার না বরং সমতার নীতি অনুযায়ী, এই সত্তার যন্ত্রণা যেকোনো সত্তার যন্ত্রণার মতোই সমভাবে বিবেচ্য হবে আর এক্ষেত্রে অন্য যেকোনো সত্তার সাথে যেকোনো অসম তুলনাও করা যেতে পারে।[৯]

তাই, সত্তা যেমনই হোক না কেন তাদের কষ্টকে সমভাবে বিবেচনা করতে হবে। বৈসাদৃশ্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য গ্রহণের পরিবর্তে সাদৃশ্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ ব্যথা ও যন্ত্রণার দিকটা যদি দেখা হয় তবে

প্রজাতির মধ্যকার বিভেদকে হ্রাস করে সমতা রক্ষা করা সম্ভব হবে। এভাবে তিনি সমতা নীতির পক্ষে ও প্রজাতিবাদের[১০] বিপক্ষে তার বক্তব্য তুলে ধরেন। তিনি উপযোগবাদী নীতি[১১] অনুসরণ করে বলেন, সর্বাধিক সদস্যের স্বার্থের সর্বনিম্ন ক্ষতিগ্রস্থ দিক আমাদের বিবেচনায় আনতে হবে অর্থাৎ সর্বাধিক সুখ নয় বরং সর্বনিম্ন ব্যাথা ও যন্ত্রণা হ্রাস করা নীতির পক্ষে মতপ্রকাশ করেন। যা কোথাও কোথাও নঞর্থক বা বিপরীত উপযোগবাদ হিসেবে অভিহিত হলেও সিঙ্গার একে চিরায়ত উপযোগবাদ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। আর এসব দিক বিবেচনা করে মানুষের মতো মানবেতর প্রাণীও সমানভাবে নৈতিক মূল্যে মূল্যবান বলে মনে করেন তিনি।

টম রিগান এবং পিটার সিঙ্গারের উপরিউক্ত আলোচনায় দেখা যাচ্ছে, বৈজ্ঞানিক গবেষণা বা চিকিৎসার ক্ষেত্রে তাঁরা মানবেতর প্রাণী ব্যবহারের বিরোধিতা করেছেন। কারণ, এসব ক্ষেত্রে প্রাণীদের বিভিন্নভাবে শারীরিক যন্ত্রণা দেওয়া হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে প্রশ্ন আসতে পারে, বিভিন্ন সব জটিল রোগের ঔষধ তৈরিতে আমরা তাহলে পরীক্ষণ পাত্র হিসেবে কাদের ব্যবহার করবো? যদি মানবেতর প্রাণীর স্থলে মানুষের উপর সেসব গবেষণা চালায় তবে মানবেতর প্রাণীর মতো সেসব মানুষেরও প্রাণের ঝুঁকি থাকবে। সেটাও তো তাহলে অনৈতিক এবং মানবাধিকারের লঙ্ঘন হবে। যদি মানুষ বা প্রাণী কাউকেই পরীক্ষণ পাত্র না করে সরাসরি সেসব পণ্য বা ঔষধের প্রয়োগ করি তাহলে যাদের উপর প্রয়োগ করা হবে তাদেরও মৃত্যু ঝুঁকি থাকবে। সেক্ষেত্রে তাহলে ঔষধের আবিষ্কার করা বা প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকতে হয়। আর এতে করে বিভিন্ন জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে ঔষধের অভাবে মানুষ এবং মানবেতর প্রাণী উভয়েরই মৃত্যুর ঝুঁকি বহুগুণ বেড়ে যাবে। আরেকটা বিষয় হলো, মানুষ নিজেদের এমনকি মানবেতর প্রাণীর প্রয়োজনেও (ভেটেনারি চিকিৎসা) ঔষধ আবিষ্কার করে থাকে যেটা মানবেতর প্রাণীর পক্ষে করা সম্ভব না এমনকি তাদের নিজেদের প্রয়োজনেও নয়। তাই, মানুষসহ মানবেতর প্রাণীর রোগমুক্তির জন্য ঔষধের আবিষ্কারে গবেষণায় প্রাণীর ব্যবহার নৈতিকভাবে প্রতিপাদনযোগ্য তবে তা যেন নির্বিচারে না হয়। আবার, যতটা যন্ত্রণা প্রাণীদের দেওয়া হয় সেটাও করা উচিত নয়। তাই, প্রাণী যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় বা যন্ত্রণা যাতে না পায় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে কাজ করতে হবে অর্থাৎ মানুষ ও মানবেতর প্রাণীর কল্যাণের জন্য ঔষধ তৈরিতে গবেষণাগারে পরীক্ষণ পাত্র হিসেবে যথাসম্ভব কষ্ট না দিয়ে কাজ করানো বা মৃত্যুর ঝুঁকি এড়িয়ে যাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। জীবনের প্রতি অধিকার মানে ক্ষতিগ্রস্থহীনভাবে বাঁচার অধিকার বা ক্ষতি এড়িয়ে চলাকেই তাঁরা বুঝিয়েছেন। জেরোমি বেন্থামও প্রাণীর যন্ত্রণাভোগের অধিকারকে সমভাবে বিবেচনা করে মানুষের সমান নৈতিক ন্যায্যতা বিধানের পক্ষপাতী ছিলেন।

উপরিউক্ত আলোচনায় যেসব দার্শনিকের প্রসঙ্গ এসেছে তাঁদের সবাই-ই কোনো না কোনোভাবে প্রাণীর নৈতিক অধিকার এবং মর্যাদার পক্ষে মতপ্রকাশ করেছেন অর্থাৎ প্রাণীর প্রতি নৈতিক বিবেচনার পক্ষপাতী ছিলেন। তবে, কিছু কিছু দার্শনিক আছেন যারা প্রথমে মানবেতর প্রাণীর নৈতিক মূল্যের বিষয়টি স্বীকারই করতে চাননি কিন্তু পরবর্তীতে বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করে নিজেদের মত পরিবর্তন করেছেন এবং মানবেতর প্রাণীর অধিকার ও মর্যাদার পক্ষে কথা বলেছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, কানাডিয়ান দার্শনিক মাইকেল ফক্স এবং আমেরিকান দার্শনিক আর জি ফ্রে। প্রথমদিকে ফক্স মনে করতেন, "প্রাণীরা নৈতিক সম্প্রদায়ের সদস্য নয় তাই তাদের প্রতি মানুষের কোনো নৈতিক বাধ্যবাধকতা নেই।"[১২] তাঁর মতে, নৈতিক পদমর্যাদার দাবীদার তারাই যারা নৈতিকভাবে চিন্তা করতে বা নৈতিক ধারণা পোষণ করতে সক্ষম। যারা নিজেদের জীবনের মূল্য সম্পর্কে, অধিকার সম্পর্কে সচেতন অর্থাৎ যারা আত্মসচেতন এবং

স্বাধীনভাবে বাঁচতে সক্ষম তারাই নৈতিক বিবেচনার দাবীদার। তিনি আরও বলেন, যারা উচ্চতর ভাষা বুঝে বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রনয়ণের পাশাপাশি বিভিন্ন জটিল সমস্যা সমাধান করতে পারে এবং যেকোনো কাজের দায়িত্ব গ্রহণে সক্ষম; তারাই শুধু নৈতিক সম্প্রদায়ের সদস্য হবার যোগ্য। কিন্তু প্রাণীদের এসব সক্ষমতা নেই আর তাই এদিক থেকে বিচার করলে মানবেতর প্রাণীর কোন নৈতিক মূল্য থাকতে পারে না। যদিও পরবর্তীতে মাইকেল ফক্স তাঁর মতের আমূল পরিবর্তন করেন। বই প্রকাশের এক বছরের পূর্বেই ফক্স তাঁর বইয়ের প্রধান থিসিস প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন, আমাদের মৌলিক নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে মানুষের মতো মানবেতর প্রাণীদেরও দুঃখ-কষ্টের কারণ না হওয়া বা ক্ষতি এড়িয়ে যাওয়া। আসলে মানবেতর প্রাণীর ক্ষতিসাধন করে সে বিষয়ে ন্যায্যতা প্রতিপাদনের কোন সুযোগ নেই।[১৩]

আর জি ফ্রে তাঁর *Interests and Rights (1980)* গ্রন্থে বলেন, কোনো সত্তার চেতনা বা চিন্তা থাকতে পারে না যতক্ষণ না সে অন্যের ভাষা বোঝে। এই মত অনুসারে, ভাষা সম্পর্কিত হচ্ছে আকাঙ্ক্ষা, বিশ্বাস, ইচ্ছার সাথে যা ছাড়া কোনো সত্তা উত্তেজিত বা হতাশাগ্রস্ত হতে পারে না। এ হিসেবে প্রাণী নৈতিক কর্তা বলে গণ্য নয় কারণ এরা স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা ভালোমন্দের পার্থক্য করতে সক্ষম নয়। যেমন: হরিণ শিকারের জন্য সিংহকে যদি নৈতিকভাবে দায়ী করা হয় তবে সেটা বোকামি হবে। তাই, মানবেতর প্রাণীদের নৈতিক সম্প্রদায়ের সদস্য হওয়ার কোন যোগ্যতা নেই বা নৈতিক বিবেচনার দাবীদার নয়।[১৪]

আর জি ফ্রেও পরবর্তীতে স্বীকার করেন যে, মানবেতর প্রাণী এবং যারা মার্জিনাল বা প্রান্তীয় পর্যায়ের (শিশু, অল্পবয়সী, বিকলাঙ্গ, অচেতনাবস্থা, স্মৃতিভ্রংশের অন্তর্ভুক্ত যারা) মানুষ, তারা নৈতিক বিবেচনা প্রত্যাশা করে। প্রাণীরাই শুধু নৈতিক সম্প্রদায়ের সদস্যদের দ্বারা ইচ্ছামতো ব্যবহৃত হয় না, যারা প্রান্তীয় পর্যায়ের মানুষ তারাও শোষিত হয়। তবে, এদের সাথে নিষ্ঠুর আচরণ করা উচিত নয় কারণ এদেরও সুখ-দুঃখের অনুভূতি আছে। এইসব ভুক্তভোগীরাও নৈতিক সম্প্রদায়ের সদস্য হওয়ার যোগ্য।[১৫]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মাইকেল ফক্স এবং আর জি ফ্রে'র প্রার্থমিক অভিমত ছিলো এরকম যে, মানুষ নিজেদের অধিকার বা ভালোত্ব সম্পর্কে সচেতন, উচ্চতর ভাষা বুঝে পরিকল্পনা প্রনয়ণ করতে এমনকি জটিল সমস্যা সমাধান করতেও সক্ষম তাই মানুষের উপর নৈতিকতা প্রযোজ্য। এক্ষেত্রে প্রশ্ন আসে, যে ভালোত্বের বিচারে মানুষ ও মানবেতর প্রাণীর মধ্যে সীমারেখা টানা হয়ে থাকে, নিজেদের সেই ভালোত্ব সম্পর্কে কি মানুষ আদৌ সচেতন? যদি তাই হতো তাহলে নির্বিচারে প্রাণী হত্যা করে খেয়ে নিজেদের অস্তিত্ব ধ্বংসের কারণ হতো না। চিন ও জাপানের মতো পৃথিবীর বহু সভ্য দেশেই কুকুর, বিড়াল, বানর,বাদুর (এটা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলেও খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়), শূকর, সাপ ইত্যাদি এমনসব প্রাণী খাদ্যাভাসে পরিণত হয়েছে যা অসংখ্য ক্ষতিকর এমনকি প্রাণীসহ মানব অস্তিত্বের জন্য হুমকিস্বরূপ ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া (ইবোলা, নিপাহ ভাইরাস, এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা, সোয়াইন ইনফ্লুয়েঞ্জা, নভেল করোনা ভাইরাস ইত্যাদির মতো) বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। তাই নৈতিক বিবেচনার খাতিরেই শুধু নয়, নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার স্বার্থে হলেও নির্বিচারে প্রাণী হত্যা করে খাওয়া বন্ধ করতে হবে।

অন্যদিকে হোমস রলস্টন মনে করেন, মানুষ হচ্ছে নৈতিক প্রতিনিধি। তাই মানবেতর প্রাণীর প্রতি মানুষের যেমন দায়িত্ব রয়েছে , তেমনি দায়িত্ব রয়েছে অন্যান্য প্রাণময় সত্তার ক্ষেত্রেও। অর্থাৎ,

শক্তিশালী সত্তার থেকে দুর্বলের যেখানে সুরক্ষা প্রয়োজন, সেখানেই নৈতিক বিবেচনার বিষয়টি চলে আসে।[১৬]

কালিকটও মনে করেন, অ-মানব প্রাণীর অধিকার ও নৈতিক মর্যাদার গুরুত্ব অনেক বেশি কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে বিষয়টি অবহেলিত হয়ে আসছে। তাই তিনি প্রাণী সমতার বিষয়টিকে পরিবেশবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণ করেন। কারণ, পরিবেশে বিভিন্ন জীব একে অপরের সাহচর্যে বেঁচে থাকে। এতে জীবন প্রক্রিয়ায় সহায়তাকারী বিভিন্ন সজীব প্রাণের সাথে সাথে মানবেতর প্রাণীর কল্যাণ এবং সুরক্ষার বিষয়টিও নিশ্চিত হয়।[১৭]

উপরিউক্ত আলোচনায় যেসব দার্শনিকবৃন্দ এসেছেন তাঁদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য থাকলেও তাঁরা বিভিন্নভাবে প্রাণীদের নৈতিক মূল্যের পক্ষে কথা বলেছেন। তবে কিছু কিছু দার্শনিক আছেন যারা প্রজাতিবাদের সমর্থনকারী, তাঁরা মানবেতর প্রাণীদের মানুষের সমান মর্যাদা তো দূরের কথা, নৈতিক বিবেচনায়ও আনতে চান না। এক্ষেত্রে দেকার্ত, কান্ট, ডোনাল্ড ডেভিডসন, কোহেনের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

আধুনিক দর্শনের জনক ফরাসী দার্শনিক রেনে দেকার্ত মানুষকেই একমাত্র সচেতন সত্তা হিসেবে মনে করেন কারণ মানুষের দেহ এবং মন আছে। তাঁর মতে, প্রাণী সচেতন সত্তা নয় কারণ প্রাণীর মন নেই। তাই প্রাণীর নৈতিক অধিকার থাকতে পারে না এমনকি প্রাণীর প্রতি মানুষের কোনো নৈতিক দায়বদ্ধতাও নেই। আমরা আমাদের চিন্তাভাবনা প্রকাশের জন্য ভাষা বা বিভিন্ন প্রতীক ব্যবহার করে থাকি যেটা প্রাণীরা করতে পারে না। আর তাই তিনি প্রাণীকে স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক সত্তা (automata) হিসেবে অভিহিত করেছেন। মানুষ যেমন বিভিন্ন কাজের প্রয়োজনে যন্ত্র তৈরি করে, তেমন যন্ত্রই হচ্ছে প্রাণী তবে তা ঈশ্বরের তৈরি। তিনি আরও উল্লেখ করেন, আমরা অনেক সময় প্রদর্শনীতে প্রাণীদের বিভিন্ন রকম নৈপুণ্য প্রদর্শন করতে দেখি আবার অনেক সময় অনেকের সামনে এসব নৈপুণ্য প্রদর্শনও করে না বা কখনও কখনও মানুষের থেকেও বেশি নৈপুণ্য দেখায়। কিন্তু উক্ত বিষয়টি এটা প্রমাণ করে না যে, প্রাণীদের মন আছে। এটা প্রাণী দেহের স্বাভাবিক প্রবণতা যা অনেকটা ঘড়ির সময় প্রদানের মতো বলে দেকার্ত মত প্রকাশ করেন। তিনি মনে করেন, মানুষ সচেতন সত্তার সাথে সাথে বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্নও কারণ মানুষ তাদের বাহ্যিক কর্মকাণ্ড এমন কারো সামনে দেখায় না যে তার কর্মকাণ্ডকে বিচার করবে। আর, মানুষের দেহ স্বয়ংক্রিয়ভাবে গতিশীল যন্ত্রও নয়; মানুষের মন এবং চিন্তা করার ক্ষমতা আছে। দেকার্তের মতে, "অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সন্নিবেশ থাকলেই যে সেখানে চিন্তাশক্তি থাকবে এমন নয়; তবুও তা আমরা প্রাণীদের মধ্যে খুঁজে থাকি। তবে এটা অনেক বেশি চমৎকারিত্বের দাবি রাখে যে, মন সর্বদা মানবদেহে খুঁজে পাওয়া যায় আর যা প্রত্যেক প্রাণিদেহে অনুপস্থিত।"[১৮]

কিন্তু আমরা জানি, প্রাণীদের রয়েছে স্বজাতীয় প্রাণীদের ভাষা বোঝার সক্ষমতা যার মধ্য দিয়ে তারা একই প্রজাতির অন্যের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলে। সেটা হতে পারে বিভিন্ন সংকেতের সমন্বয় যা মানুষেরা বুঝতে সক্ষম না হলেও পোষা প্রাণীদের আচরণের মধ্য দিয়ে মাঝেমধ্যে উপলব্ধি করা যায় বলে বিবিসি'র আর্থ বিষয়ক একটি প্রবন্ধে প্রকাশিত হয়।[১৯] আবার, প্রাণীদের প্রতি পীড়ণমূলক আচরণ মানুষের প্রতিও একই আচরণে প্ররোচিত করতে পারে। তাছাড়া প্রাণী সংবেদনশীল তাই সহিংস আচরণ তো কাম্যই নয় বরং মানুষ-প্রাণী নির্বিশেষে সদাচারণই নৈতিক বিবেচনার দাবী রাখে।

জার্মান বিচারবাদী দার্শনিক ইমানুয়েল কান্টও মানুষের অবস্থানকে উর্ধ্বে রেখেছেন। তিনি মনে করেন, মানুষের মর্যাদা সবার উপরে আর তাই সব ধরণের অধিকার মানুষের উপরেই আরোপযোগ্য। ভালোত্ব বা মন্দত্বের বিচারে নয় বরং মানুষ হওয়ার জন্যই মানুষের স্থান জগতের সকল প্রাণীর উর্ধ্বে। মানুষের মতো প্রাণীর স্বাধীন ইচ্ছা থাকতে পারে না কারণ প্রাণী আত্মসচেতন নয়। তাদের কার্যকলাপও আবশ্যিকভাবে নির্ধারিত হয় তাদের ইন্দ্রিয়ের তাড়না দ্বারা (sensory impulses)। তাঁর মতে, স্বতঃমূল্য থাকতে গেলে বৌদ্ধিক সক্ষমতা, চেতনা শক্তি, নৈতিক বিচারের ক্ষমতা, সদিচ্ছা ইত্যাদি থাকতে হয় যা প্রাণীর নেই। তাঁর মতে, "সব প্রাণীই উপায় হিসেবে বিদ্যমান থাকে এবং তা অবশ্যই নিজের ভালোর জন্য নয়। এই কারণে যে, তাদের কোনো আত্মসচেতনতা নেই আর যেখানে মানুষ থাকে লক্ষ্য হিসেবে...। "[২০] তিনি আরও বলেন, প্রাণীদের প্রতি কর্তব্য মানে পরোক্ষভাবে মনুষ্যজাতির জন্যই কর্তব্য করা আর এই কর্তব্যবোধ অন্য মানুষের প্রতিও কর্তব্য করার শিক্ষা দেয়। এদিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, কান্ট প্রাণীদের পরতঃমূল্যের অধিকারী হিসেবে দেখেছেন অর্থাৎ উপায় হিসেবে। কিন্তু মানুষকে দেখেছেন উদ্দেশ্য হিসেবে, উপায় হিসেবে নয়। কারণ মানুষের মর্যাদা সবার উপরে আর এজন্য মানুষেরই একমাত্র নৈতিক মূল্য আছে বলে তিনি মনে করেন।

দেকার্ত এবং কান্টের আলোচনায় এটা প্রতীয়মান যে, যেসব সত্তার আত্মসচেতনতা নেই, আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা নেই, যুক্তি দিতে বা অন্যের ভাষা বুঝতে সক্ষম নয়; সেসব সত্তার উপর স্বতঃমূল্য আরোপ করা যায় না। আর এসবই মানুষ ও মানবেতর প্রাণীর মধ্যে নৈতিক পার্থক্যের সীমারেখা টানে। যদি তাই হয় তবে প্রশ্ন আসে যে- অনেক শিশু, বৃদ্ধ, মানসিক ভারসাম্যহীন মানুষ আছেন যারা আত্মসচেতন নয় এমনকি অনেক অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন এবং অনেক প্রাণীর থেকেও কম সচেতন। আর তাদের উপর যদি স্বতঃমূল্য আরোপ করা যায় বা তারা যদি নৈতিক বিবেচনার যোগ্য হয় তবে মানবেতর প্রাণী কেন নয়? আমরা জানি, এমন অনেক শিম্পাজি আছে যারা প্রতীক ভাষা ব্যবহারে পারদর্শী, আত্মসচেতন। এমনকি গরিলারাও বিভিন্নভাবে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয় যা আমাদের মানব প্রজাতির কিছু মানুষের (মানসিক প্রতিবন্ধী) চেয়ে বেশি সচেতন। যদি এই বিশেষ গুণাবলি মানুষ ও মানবেতর প্রাণীর মধ্যে সীমারেখা টানে তবে কিছু বিশেষ মানুষ নয় বরং কিছু মানবেতর প্রাণী নৈতিক বিবেচনার যোগ্য হবে। এমনকি সেই একই যুক্তিতে উক্ত মানুষগুলোকে হত্যা করা বা গবেষণাগারে পরীক্ষণপাত্র হিসেবে ব্যবহার করার ন্যায্যতা প্রতিপাদন করা যাবে। প্রকৃতপক্ষে বিশেষ কোন দক্ষতা অর্থাৎ আত্মসচেতনতা, স্বনিয়ন্ত্রণ বা বুদ্ধিমত্তা নৈতিক মর্যাদা আরোপের সীমারেখা টানতে পারে না। তাহলে মানুষের ক্ষেত্রেও স্বতঃমূল্য বা নৈতিক বিবেচনার বিষয়টি প্রশ্নসাপেক্ষ হবে।[২১] তাই, বৌদ্ধিক সক্ষমতা বা আমাদের প্রয়োজনে নয় বরং মানবেতর প্রাণী স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবেই নৈতিক মূল্যে মূল্যবান। তাদের আত্মসচেতনতা না থাকলেও রয়েছে চেতনা, মাঝে মাঝে আত্মরক্ষার ক্ষমতাও প্রদর্শন করতে দেখা যায়। এরাও স্বতঃমূল্যে মূল্যবান আর যেটা মানুষের ব্যবহারের উপর নির্ভর করে না বরং মানুষের মতোই প্রকৃতির সৃষ্ট জীব হিসেবে নিজস্ব মূল্য আছে। আর স্বতঃমূল্য থাকা মানেই নৈতিকমূল্য আরোপ করা যায় আর তাই মানবেতর প্রাণীর প্রতি সদয় আচরণ করতে হবে। আমরা যদি মানবেতর প্রাণীর প্রতি নৈতিক বা সদয় আচরণ না করি তবে অভ্যাসবশত মানসিকভাবে অপরিণত ব্যক্তির প্রতিও সদয় বা নৈতিক আচরণ করতে সক্ষম হব না।

আবার, ডেভিডসন তাঁর *Inquires into Truth and Interpretation* (1984) গ্রন্থে আর জি ফ্রে'র প্রথমাংশের বক্তব্যকে সমর্থন করে বলেন, ভাষা হচ্ছে অন্যের চিন্তা-চেতনা বোঝার মাধ্যম। ভাষার মাধ্যমে আমরা আমাদের মনের ভাব বা চিন্তা প্রকাশ করি। ভাষা ছাড়া আমরা আমাদের মনের ভাব আদান-প্রদান করতে বা ভালো-মন্দের পার্থক্য করতে পারব না। একটি শিশুকে যেমন কোনো মূর্তি ভাঙার জন্য দায়ী করা যাবে না তেমনি বোনকে আঘাত করার জন্যও নিন্দা করা যাবে না। প্রাণীরা নৈতিক কর্তা নয়; তাদের কোনো নৈতিক পছন্দ নেই বা নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণেও সক্ষম নয়। তাই, মানবেতর প্রাণীর নৈতিক মূল্য নেই।[২২]

তবে কথা হচ্ছে, ভাষার মধ্য দিয়ে আমরা কিন্তু পৃথিবীর সব মানুষের মনের ভাব বুঝতে পারিনা কারণ বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতি, ভিন্ন ভিন্ন ভাষা। তাছাড়া একই শব্দের বা বাক্যের রয়েছে অঞ্চলভিত্তিক অর্থগত পার্থক্য তাই সকলের মনের ভাব সব মানুষের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। আবার, ভাষা বুঝে ভালো-মন্দের পার্থক্য করার সক্ষমতা থাকলেই যে আমরা সব সময় ভালো কাজ করি তেমনটিও নয়। তাহলে সন্ত্রাসবাদের জন্ম হতো না বা চাঁদাবাজির, খুন, জখমের মতো ঘটনাগুলোও ঘটত না। এজন্য ভাষা দ্বারা মানুষ ও মানবেতর প্রাণীর মধ্যে নৈতিক পার্থক্যের সীমারেখা টানা যুক্তিসঙ্গত নয়।

আমেরিকান দার্শনিক কার্ল কোহেনও মনে করেন, প্রাণীদের কোনো অধিকার নেই কারণ প্রাণীরা নৈতিক বিচারের ক্ষমতা রাখে না। কিন্তু মানুষের নৈতিক বিচারের ক্ষমতা আছে এমনকি স্ব বিচার-বিবেচনাও করতে পারে। মানুষ নৈতিক সম্প্রদায়ের সদস্য আর যা নৈতিক নিয়ম দ্বারা পরিচালিত। তাই মানুষের নৈতিক অধিকার রয়েছে কিন্তু প্রাণীর এসব অধিকার নেই। এজন্য প্রাণীরা নৈতিক সম্প্রদায়ের সদস্যও নয়। তাই, যদি কোনো গবেষণা কার্যে প্রাণীকে ব্যবহার করা হয় তবে অধিকার লঙ্ঘন হবে না কারণ প্রাণীর লঙ্ঘিত হওয়ার মতো কিছু নেই। কোহেন মনে করেন, প্রাণীদের প্রতি আমাদের দায়-দায়িত্ব আছে যেমনটা একজন ডাক্তারের তাঁর রোগীর প্রতি, মেষপালকের তার ভেড়ার প্রতি বা রাখালের তার গরুর প্রতি। তিনি বলেন, আমার কুকুরের কোন অধিকার নেই নিয়মিত পরীক্ষা বা ভেটেনারি চিকিৎসা পাওয়ার তবে আমার দায় আছে তাকে এসব দেওয়ার। এই দায় তৈরি হয় বিভিন্ন পরিস্থিতি থেকে, হতে পারে মমত্ববোধ বা দয়া থেকে কিন্তু অধিকার থেকে অবশ্যই নয়। আর এজন্য গবেষণাকার্যে পরীক্ষণ পাত্র হিসেবে প্রাণীর ব্যবহারকে সংকুচিত করতে পারি না। মানুষ স্বেচ্ছায় এসব কার্যে নিজেকে সংযুক্ত করতে পারে কিন্তু এরূপ ইচ্ছে প্রাণীদের জন্য অসম্ভব। কোহেনের মতে, "প্রাণীদের... স্বাধীনভাবে নৈতিক বিচার করার দক্ষতার অভাব রয়েছে। তারা এমন প্রকৃতির সত্তা নয় যাতে নৈতিক অধিকারের চর্চা করতে বা সে অনুযায়ী প্রতিক্রিয়া করতে সক্ষম হবে। এজন্য প্রাণীদের কোন অধিকার নেই বা থাকতে পারে না। "[২৩]

ব্রিটিশ সাংবাদিক পলি টয়েনবি *ইন্ডেপেনডেন্ট* পত্রিকায় প্রাণীর অধিকার প্রসঙ্গে বলেছিলেন:

> অধিকারের প্রশ্নে প্রথমে অবশ্যই আমরা আমাদের বোধশক্তিকে তীক্ষ্ণ রাখি আর প্রাণীদের এসব কিছু নেই। অধিকার শুধুমাত্র মানুষের ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য, কারণ অধিকার সুদৃঢ়ভাবে দায়িত্বের সাথে সংযুক্ত। অধিকারের উৎপত্তি ঘটে একই জনগোষ্ঠীর মধ্যে মানবীয় চুক্তি, সামাজিক চুক্তি থেকে। নৈতিক বাধ্যবাধকতার সাথে সংযুক্ত হয়েই অধিকার আসে...[২৪]

সুতরাং টয়েনবির মতে, নৈতিকতা একটি সামাজিক চুক্তি। তিনি মনে করেন, প্রত্যেকটা বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন সত্তাই নিজের সর্বোচ্চ স্বার্থ খোঁজে এবং নৈতিকতাকে গ্রহণ করে যদি তা ব্যক্তির জন্য উপযোগিতা বয়ে আনে। এভাবে একজন বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন সত্তা অন্য আরেকজন বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন সত্তার সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়াকে বৌদ্ধিক মনে করে যা অবশ্যই নৈতিক নিয়মের দ্বারা হবে। তারা একে অন্যের জন্য সর্বোচ্চটা দিয়ে কাজ করবে। কিন্তু প্রাণীরা এই সামাজিক চুক্তির ভিত্তি বুঝতে সক্ষম নয়, এমনকি অন্যের অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনেও সক্ষম নয় যেটা বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন প্রাণী করতে পারে। সামাজিক চুক্তির সাথে দায়িত্ব জড়িয়ে আছে আর মানুষ অন্যের অধিকারের ব্যাপারেও সচেতন। আর এর আওতায় প্রাণীরা পড়েনা কারণ মানুষের মতো তারা দায়িত্ব পালনে সক্ষম নয়, আত্মসচেতনও নয়। অধিকার থাকার শর্ত হচ্ছে অন্যের অধিকারকে সম্মান করা আর যে বিবেচনা প্রাণীদের নেই। তাই প্রাণীদের কোনো অধিকার থাকতে পারে না বলে তিনি মনে করেন।[২৫]

প্রশ্ন হচ্ছে, মানুষ কি আদৌ অন্যের অধিকারের ব্যাপারে সচেতন বা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলেই কি সেটা রক্ষা করে সবসময়? যদি তাই হতো তাহলে সমাজে এত হানাহানি বা কোন্দল সংঘটিত হতো না এমনকি চারিদিকে এত বিচ্ছেদ বা হাহাকারেরও জন্ম হতোনা। নৈতিক বিচারের ক্ষমতা থাকলেই যে মানুষ সবসময় নৈতিকভাবে কাজ করে থাকে তেমনটিও নয়। তাহলে ঘুষ, দূর্নীতি জাতীয় শব্দগুলোর জন্মই হতো না। আমরা জানি, ব্যক্তিস্বার্থ রক্ষাই অধিকাংশ মানুষের প্রধান লক্ষ্য। যদি মানুষ তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতো তাহলে এত বৃদ্ধাশ্রম বা শিশুসদনও গড়ে উঠত না। সুতরাং সামাজিক দায়িত্ব, প্রতিশ্রুতি বা অন্যের অধিকারের প্রতি সম্মানের দোহাই দিয়ে মানুষ ও মানবেতর প্রাণীর মধ্যে সীমারেখা টেনে মানবেতর প্রাণীর নৈতিক অধিকার লংঘন করা বা সে অধিকার থেকে বঞ্চিত করা নৈতিক কর্তা হিসেবে একদমই উচিত নয়।

উপরিউক্ত আলোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, অনেক দার্শনিকই স্তরবিন্যাসের আকারে মানুষের স্থানকে উর্ধ্বে রেখেছেন আর মানবেতর প্রাণীর নৈতিক মূল্যের ব্যাপারে নারাজ থেকেছেন। মানবেতর প্রাণী হত্যা করা অবশ্যই গর্হিত অপরাধ এবং এসব থেকে বিরত থাকতে হবে। প্রাণীর প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ কোনো মতেই কাম্য নয়। মানবেতর প্রাণীর প্রতি আমাদের নৈতিক আচরণ করতে হবে তা না হলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার সাথে সাথে পৃথিবী মানুষ বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়বে। আমরা জানি, মানবেতর প্রাণী থেকে শুরু করে পৃথিবীর প্রতিটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবই মানুষের কল্যাণে ব্যবহৃত হয়। যেমন: ব্যাঙ বিভিন্ন কীটপতঙ্গ খেয়ে তাদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে কৃষি অর্থনীতিতে বড় ধরণের ভূমিকা রাখছে। ডেঙ্গু, চিকনগুনিয়াসহ বিভিন্ন মশাবাহিত রোগের বাহক মশার লার্ভা ব্যাঙাচি অবস্থাতেই খেয়ে থাকে যা মানবকূলের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ। এভাবে মানবকল্যাণে প্রতিটি মানবেতর প্রাণী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলছে। এসবই ইকোসিস্টেমের সাথে জড়িত অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। নির্বিচারে মানবেতর প্রাণী হত্যা করলে জীববৈচিত্র্য নষ্ট হবে আর এতে বাস্তুতন্ত্র নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মুখথুবড়ে পড়ে পরিবেশের মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনবে। তাই, মানবজাতির স্বার্থের সাথে মানবেতর প্রাণীর প্রয়োজনের জন্য বাস্তুসংস্থানকে টিকিয়ে রাখার তাগিদে হলেও একজন নৈতিক কর্তা হিসেবে প্রাণীর প্রতি নৈতিক আচরণ করতে হবে। প্রশ্ন আসতে পারে যে, সুস্থ জীবনের জন্য আমিষের প্রয়োজন আর সে চাহিদা কীভাবে পূরণ হবে যদি মানবেতর প্রাণী খাদ্য

তালিকা থেকে বাদ যায়? এক্ষেত্রে পুষ্টিবিজ্ঞান বলে, প্রাণীজ আমিষের পরিবর্তে উদ্ভিজ আমিষ সে চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম। প্রাণী অধিকারের সমর্থকগণও মনে করেন, মানবেতর প্রাণীর ক্ষতিসাধন না করে যদি স্বাভাবিক জীবনের নিশ্চয়তা বিধান করা যায় তবে একজন নৈতিক কর্তা হিসেবে সে কাজই করা উচিত। এতে মানবেতর প্রাণীর স্বার্থ যেমন রক্ষিত হবে তেমনি একজন নৈতিক কর্তা হিসেবেও দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হবে।

আমরা জানি, মানুষ এবং প্রাণী পরস্পর নির্ভরশীল সত্তা। নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য পরস্পর পরস্পরের প্রয়োজনে লাগে। তাছাড়া, নৈতিক মূল্যে মূল্যবান বলে প্রাণীর প্রতি আমরা নির্দয় বা নিষ্ঠুর আচরণ করা থেকে বিরত থাকবো তবে এমন চরমপন্থা অবলম্বন করবো না যাতে গোটা সভ্যতা হুমকির মুখে পড়ে।উদাহরণ হিসেবে এস্কিমো জনগোষ্ঠীর কথা বলা যায়। এস্কিমো জনগোষ্ঠীরা মূলত উত্তর আমেরিকা ও পূর্ব সাইবেরিয়ার সুমেরুবৃত্ত অঞ্চলে বরফ ঢাকা অঞ্চলের মতো এক প্রাকৃতিক পরিবেশে বসবাস করে যেখানে আহার্য হিসেবে প্রাণী না পেলে না খেয়ে মারা যেতে হবে। এতে এদের অস্তিত্ব সংকটে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই, এসব ক্ষেত্রে প্রাণীভক্ষণের নৈতিক ন্যায্যতা প্রতিপাদন করা যায়। তবে এর অর্থ এই নয় যে, শিল্পায়িত সমাজেও এটাকে ন্যায্য হিসেবে প্রতিপাদন করা হচ্ছে। কারণ, শিল্পায়িত সমাজে খাদ্যের অনেকটা যোগান পাওয়া যায় উদ্ভিদ থেকে তাই এসব সমাজে নির্বিচারে প্রাণী হত্যা বিলাসিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এসব ক্ষেত্রে নির্বিচারে প্রাণী হত্যা অনৈতিক বলে বিবেচিত হবে।[২৬]

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, অনেক সময় অনেক অসুস্থ প্রাণী জীবনের জন্য হুমকি বয়ে আনে যেমন: উন্মাদ কুকুর বা ভাইরাস বহনকারী বিভিন্ন প্রাণী। আর সেসব ক্ষেত্রে তাদের জীবন নাশ না করলে অগণিত মানুষ এমনকি প্রাণীর জন্যও মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনবে। এমন পরিস্থিতিতে তাদের জীবন নাশের প্রক্রিয়াটাও যেন স্বাভাবিক হয় বা সর্বনিম্ন কষ্টের হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তবে এর অর্থ এই নয় যে, নির্বিচারে প্রাণী হত্যা বা শিকারকে সমর্থন করা হচ্ছে। শিকার, খেলাধুলা বা বানিজ্যিক উদ্দেশ্যে মানবেতর প্রাণীর ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে হবে। খেলাধুলা তথা বানিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য প্রাণীদের চরমতম কষ্ট ভোগ করতে হয় যেমন: ঘোড়ার গাড়ি টানার জন্য পায়ের খুর কেটে লোহার চাকা পরানো বা সার্কাসে বিভিন্নভাবে কষ্ট দিয়ে নৈপূণ্য প্রদর্শন করানো ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে রোধ করতে হবে। আবার বিলাস দ্রব্য বা সৌখিন সামগ্রী হিসেবে ব্যবহারের জন্য প্রাণীদের মুক্তভাবে চরে বেড়ানোর বদলে আবদ্ধ করে রাখাটাও নৈতিক অধিকারের লংঘন বলে বিবেচিত। কারণ, চেতনাসম্পন্ন জীব হিসেবে প্রাণীদেরও অধিকার আছে তাদের নিজস্ব পরিবেশে শঙ্কাহীনভাবে চলার।

পরিশেষে বলা যায় যে, মানবেতর প্রাণীকে নৈতিক বিবেচনাভুক্তকরণ শুধু পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, বাস্তুতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখার জন্যই নয়; মানবেতর প্রাণীর ন্যায্য অধিকার রয়েছে বিলাসদ্রব্য বা বিনোদন এমনকি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য অনৈতিকভাবে ব্যবহার না হওয়ার। তবে, যেসব ক্ষেত্রে সভ্যতার সংকটে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে সেসব দিককে অবশ্যই বিবেচনায় রাখতে হবে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১। Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (Oxford: Clarendon Press, 'A new edition, corrected by the author', 1823), p. 310.

২। Ibid., p. 311.

৩। Mary Midgley, Animals and Why They Matter (Harmondsworth: Penguin Books, 1983), p. 98.

৪। Mary Midgley, BEAST AND MAN: The Roots of Human Nature, ed. 1995 (London: Routledge, 1995), pp. 25-27.

৫। Paul W. Taylor, Respect for Nature, 25th Anniversary edition (London: Princeton University Press, 2011), pp. 70-80.

৬। Tom Regan, The Case for Animal Rights (Berkeley: University of California Press, 1983), passim.

৭। Tom Regan, ÒThe Case for Animal RightsÓ, In Defence of Animals, edited by Peter Singer (Oxford: Basil Blackwell, 1985), pp. 23-24.

৮। Peter Singer, Practical Ethics, 3rd edition (Cambridge University Press, 2011), p. 48.

৯। Ibid., p. 50.

১০। প্রত্যয়টি ১৯৭০ সালে প্রথম ব্যবহার করেন রিচার্ড রাইডার। প্রজাতিবাদে মানুষের নিজের প্রজাতির বাইরে অন্যান্য প্রজাতির জীবের অস্তিত্ব, অধিকার, মর্যাদাকে অস্বীকার করা হয় এবং নিজের প্রজাতিকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দেওয়া হয়ে থাকে। এমনকি অন্য প্রজাতিকে আঘাত করাও নৈতিকভাবে মূল্যায়ন করে না।

১১। সমাজের অধিকসংখ্যক মানুষ ও চেতনশীল প্রাণীর অধিক সুখের নিশ্চয়তা বিধান করা এবং দুঃখকে যথাসম্ভব হ্রাস করাই হলো মানবজীবনের নৈতিক আদর্শ।

১২। Peter Singer (ed.), A Companion to Ethics (UK: Blackwell Publishers Ltd, 1991), p. 343.

১৩। Ibid., p. 345.

১৪। Ibid., p. 344.

১৫। Ibid., p. 345.

১৬। Rolston, H., III, Duties to Endangered Species, Elliot, R., (ed.), Environmental Ethics, Oxford University Press: Oxford, 1995, passim.

১৭। Callicott, J. B., 'Animal Liberation: A Triangular Affair', in LaFollette, H., (ed.), Ethics in Practice: An Anthology, Blackwell, Oxford, 1997, p. 671.

১৮। Rene Descartes, 'Animals are machine', in Tom Regan and Peter Singer (eds.), Animal Rights and Human Obligations, 2nd edition (New Jersey: Prentice Hall, 1989), pp. 13-19.

১৯। Shreya Dasgupta, 'Can any animals talk and use language like humans?' , BBC, Earth story (16 February, 2015).

২০। Immanuel Kant, Lectures on Ethics, edited by Peter Heath and J. B. Schneewind, translated by Peter Heath (UK: Cambridge University Press, 1997), p. 212.

২১। Peter Singer (2011), *op. cit.*, passim, Chap. 3,5.

২২। Peter Singer (1991), *op. cit.*, p. 344.

২৩। Carl Cohen, ÒThe Case for the Use of Animals in Biomedical ResearchÓ, The New England Journal of Medicine, Vol. 315, No.14 (October, 1986), p. 866.

২৪। Anne Thomson, Critical Reasoning in Ethics: A practical Introduction (London and Newyork: Routledge, 2002), p. 113.

২৫। *Ibid.*, p. 191.

২৬। ড. প্রদীপ কুমার রায় (অনূদিত), *ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা*, তৃতীয় সংস্করণ (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমি, ২০১২), পৃ. ৪৮।